بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ০২ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধের ঘটনাবলির পেক্ষাপটে আমি সাহাবীদের কুরবানি এবং তাঁদের রসূলপ্রেমের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছিলাম। সেগুলোর মাঝে হযরত আলীর বীরত্বের ঘটনাবলিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আলী সম্পর্কে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে ইবনে কামিয়া যখন হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে শহীদ করে তখন সে মনে করে, সে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে শহীদ করে দিয়েছে। অতএব সে কুরাইশের কাছে ফিরে যায় এবং বলে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে ফেলেছি। হযরত মুসআব যখন শহীদ হন তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) পতাকা হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করেন। অতএব হযরত আলী এবং অন্য মুসলমানরা লড়াই করেন। হযরত আলী একের পর এক কাফিরদের পতাকাবাহকদের হত্যা করেন। মহানবী (সা.) কাফিরদের একটি দলকে দেখে হযরত আলীকে তাদের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী আমর বিন আব্দুল্লাহ্ জুমহীকে হত্যা করেন এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) কাফিরদের দ্বিতীয় দলের ওপর আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী, শায়বা বিন মালেককে হত্যা করেন। তখন হযরত জিবরাঈল বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! নিশ্চয় তিনি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। [অর্থাৎ হযরত আলী সম্পর্কে এ কথা বলেন।] তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আলী আমার আর আমি আলীর। তখন জিবরাঈল বলেন, আমি আপনাদের দুজনের সাথে আছি। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে শিয়ারা বাড়াবাড়ি করে থাকে।

হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে লোকেরা দূরে সরে পড়েছিল তখন আমি শহীদদের লাশের মাঝে সন্ধান করে তাদের মাঝে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে পাই নি। তখন আমি (মনে মনে) বলি, খোদার কসম, মহানবী (সা.) পলায়নকারী নন আর আমি তাঁকে শহীদদের মাঝেও খুঁজে পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব যতক্ষণ আমি নিহত না হই, লড়ে যাওয়ার মাঝেই আমার মঙ্গল নিহিত। হযরত আলী বলেন, এরপর আমি আমার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলি আর কাফিরদের ওপর আক্রমণ করি। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমি দেখতে পাই, মহানবী (সা.) তাদের মাঝখানে আছেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব রেওয়ায়েত করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আলী ১৬টি আঘাত পেয়েছিলেন।

সমস্যাবলীর অন্তরালে কল্যাণভাণ্ডার লুক্কায়িত থাকে– হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

হযরত আলী উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হযরত ফাতেমাকে নিজের তরবারি দেন এবং বলেন, এটিকে ধুয়ে দাও; আজ এই তরবারি অনেক কাজ করেছে। মহানবী (সা.)

হযরত আলীর এই কথা শুনছিলেন। তিনি বলেন, আলী! শুধু তোমার তরবারিই কাজ করে নি, তোমার আরও অনেক ভাইয়েরা রয়েছে যাদের তরবারি নৈপুণ্য দেখিয়েছে। তিনি (সা.) ছয়-সাতজন সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বলেন, তাদের তরবারি তোমার তরবারির চেয়ে কম ধারালো ছিল না। এ প্রেক্ষিতে হযরত আবু তালহা আনসারী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, যখন উহুদের যুদ্ধ হয় তখন মানুষ পরাজিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর হযরত আবু তালহা মহানবী (সা.)-এর সামনে তাঁকে নিজ ঢালের আড়ালে নিয়ে দণ্ডায়মান থাকেন। তিনি এমন তিরন্দাজ ছিলেন যিনি ধনুক জোরে টানতেন। তিনি সেদিন দুটি বা তিনটি ধনুক ভাঙেন। অর্থাৎ এত জোরে টানতেন যে, ধনুক ভেঙে যেত। আর তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তিরের তূণ সাথে নিয়ে সেদিক দিয়ে যেত মহানবী (সা.) তাকে বলতেন, আবু তালহাকে তির দিয়ে দাও। অর্থাৎ তিনি দক্ষ তিরন্দাজ, তাই নিজের তিরও তাকে দিয়ে দাও। তিনি তখন মহানবী (সা.)-এর সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন। হযরত আনাস বলতেন, মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে মানুষকে দেখতে গেলে হযরত আবু তালহা বলতেন যে, بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يُصِيبُكَ سَهمٌ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ **(বে আবি আনতা ওয়া উম্মী ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লা ইয়ুসিবুকা সাহমুন নাহরী দূনা নাহরিক)** অর্থাৎ আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত, মাথা উঁচু করে দেখবেন না পাছে তাদের (নিক্ষিপ্ত) তিরগুলোর মধ্য থেকে কোনো তির আপনার দেহে বিদ্ধ হয়। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে আছে। এ হাদীসটি বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা একটি মাত্র ঢাল দিয়েই মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করছিলেন। হযরত আবু তালহা দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির চালাতেন তখন মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে তার তির কোথায় গিয়ে পড়েছে তা দেখতেন।

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহার এই পঙক্তি পাঠেরও উল্লেখ পাওয়া যায়,

وَجْهِي لِوَجْهِكَ الوِقَاءُ، وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الفِدَاءُ

(ওয়াজহী লেওয়াজহিকাল ভিকাউ
ওয়া নাফসী বেনাফসিকাল ফিদাউ)

অর্থাৎ, আমার চেহারা আপনার চেহারাকে রক্ষার জন্য। আর আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য উৎসর্গিত।

হযরত আবু তালহা আনসারী সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, আবু তালহা আনসারী তির চালাতে চালাতে তিনটি ধনুক ভেঙেছেন আর শত্রুদের তিরের বিপরীতে বুক পেতে দিয়ে মহানবী (সা.)-এর দেহকে নিজ ঢাল দ্বারা আড়াল করেছেন।

অতঃপর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র উল্লেখ রয়েছে। তিনি (অর্থাৎ পূর্বের জন) ছিলেন আনসারী আর ইনি কুরাইশভুক্ত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে তির প্রতিহত করেন। হযরত তালহা উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেদিন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে অবিচল থাকেন আর তাঁর হাতে মৃত্যুর শর্তে বয়আত করেন। মালেক বিন যুহায়ের মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে। তখন হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর চেহারাকে নিজের হাত দ্বারা রক্ষা করেন। তির তার কনিষ্ঠায় আঘাত

করে যার ফলে তা অকেজো হয়ে যায়। যখন প্রথম তিরটি তার হাতে লাগে, তখন কষ্টের তীব্রতায় তার মুখ থেকে আহ্ শব্দ বের হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি যদি বিসমিল্লাহ্ বলতেন তাহলে এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতেন যে, মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকত।

এই ঘটনারই বিস্তারিত বিবরণ সীরাতুল হালাবিয়াতে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে রয়েছে যে, কায়েস বিন আবু হাযম বলেন, আমি উহুদের দিন হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্‌র হাতের অবস্থা দেখি যা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে তির থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি উক্তি অনুসারে, তাতে বর্শা লেগেছিল এবং তা থেকে এত রক্ষপাত হয় যে, তিনি দুর্বলতায় অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মুখমণ্ডলে পানির ছিটা দেন ফলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। চেতনা ফিরে আসামাত্রই তিনি জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) কেমন আছেন? হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, তিনি (সা.) ভালো আছেন আর তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হযরত তালহা (রা.) বলেন, الحمدلله كل مصيبة بعده جلل (আলহামদুলিল্লাহি কুল্লু মুসিবাতিন বা'দাহু জালাল) অর্থাৎ, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার; মহানবী (সা.)-এর যদি ভালো থাকেন তাহলে সকল দুঃখ-বেদনা তুচ্ছ।

আয়েশা ও উম্মে ইসহাক, যারা হযরত তালহা (রা.)-র কন্যা ছিলেন, তারা উভয়ে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমাদের পিতার দেহে ২৪টি আঘাত লেগেছিল, যার মাঝে একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আঘাত মাথায় লেগেছিল এবং পায়ের রগ কেটে গিয়েছিল, আঙুল অকেজো হয়ে গিয়েছিল আর অন্যান্য আঘাত শরীরের (বিভিন্ন স্থানে) ছিল। তিনি মুর্ছা গিয়েছিলেন। (এদিকে) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাঁর মুখমণ্ডলও ক্ষতবিক্ষত ছিল। তিনি (সা.)-ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। হযরত তালহা (রা.) তাঁকে নিজের পিঠে বহন করে এমনভাবে উল্টো পায়ে পেছনে যেতে থাকেন যেন কোনো মুশরিক (তার) সামনে পড়লে তিনি তার সাথে লড়াই করতেন। এভাবে তিনি তাঁকে (সা.) গিরিপথে নিয়ে যান এবং হেলান দিয়ে বসিয়ে দেন।

উহুদের যুদ্ধ এবং নির্ভীক ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে,

উহুদের যুদ্ধের দিন যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে আর মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন কয়েকজন সাহাবী ছুটে এসে মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে যান, যাদের সংখ্যা খুব বেশি হলে ত্রিশজন ছিল। কাফিররা সর্বশক্তি দিয়ে সেই স্থানে হামলা করে যেখানে মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান ছিলেন। একের পর এক সাহাবী তাঁর সুরক্ষায় নিহত হচ্ছিলেন। অসিচালকরা ছাড়াও তিরন্দাজরা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য তির নিক্ষেপ করছিল। কুরাইশ বংশোদ্ভূত মুহাজির (সাহাবী) তালহা (রা.) যখন দেখলেন, শত্রুরা সকল তির মহানবী (সা.)-এর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করছে তখন তিনি নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সামনে ধরে রাখেন। লক্ষ্যভেদী উপর্যুপরি তির তালহার হাতে বিদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু এই দুঃসাহসী ও বিশ্বস্ত সাহাবী নিজের হাতকে তিল পরিমাণও নড়তে দেন নি। এমনিভাবে তির বিদ্ধ হতে থাকে আর, তালহা (রা.)-র হাত আঘাতের তীব্রতার কারণে একেবারে অকেজো হয়ে যায় আর তখন কেবল তার একটি হাতই রয়ে যায়। বহু বছর পর ইসলামের চতুর্থ খিলাফতের যুগে যখন মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাধে তখন কোনো এক শত্রু তির্যক মন্তব্য করে

তালহাকে লুলা বলে সম্বোধন করে, অর্থাৎ তোমার হাত অকেজো। তখন আরেকজন সাহাবী বলেন, হ্যা! লুলা তো বটেই, কিন্তু কত বরকতমণ্ডিত এই লুলা! তুমি কি জানো, তালহার এই হাত মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষার্থে লুলা হয়েছিল? উহুদের যুদ্ধের পর জনৈক ব্যক্তি তালহা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, যখন আপনার হাতে তির এসে বিদ্ধ হতো তখন কি আপনি ব্যথা পেতেন না আর আপনার মুখ থেকে কি উফ্ শব্দ বের হতো না? তালহা (রা.) উত্তরে বলেন, **'ব্যথাও হতো আর উফ্ শব্দও বের হবার উপক্রম হতো, কিন্তু আমি উফ্ করতাম না; পাছে উফ্ করতে গিয়ে আমার হাত সরে যায় আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় এসে তির বিদ্ধ হয়।'**

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) সেসব নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীর একজন ছিলেন, যারা পরম সাহসিকতা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আয়েশা বিনতে সা'দ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) বলেছেন, শত্রুরা যখন পুনরায় আক্রমণ করে তখন আমি একদিকে সরে যাই। আমি বলি, আমি তাদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেবো। হয় আমি নিজেই মুক্তি লাভ করব কিংবা শহীদ হয়ে যাব। (এরপর) আচমকা আমি রক্তিম চেহারার অধিকারী এক ব্যক্তিকে দেখি। তার বিরুদ্ধে মুশরিকদের জয়ী হবার উপক্রম হতেই সে নিজের হাতে কঙ্কর ভর্তি করে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে, তখন আমার ও সেই ব্যক্তির মাঝে অকস্মাৎ মিকদাদ চলে আসে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, হে সা'দ! ইনি মহানবী (সা.)! যিনি তোমাকে ডাকছিলেন। (একথা শুনে) আমি দাঁড়াই এবং আমার এমন মনে হলো, আমি যেন কোনো আঘাতই পাই নি। আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে গেলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসান। আমি তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করি আর বলি, **'হে আল্লাহ্! এটি তোমার তির, এদ্বারা তোমার শত্রুদের বিনাশ করে দাও'**। অপরদিকে মহানবী (সা.) বলছিলেন, **"হে আল্লাহ্! তুমি সা'দ-এর দোয়া গ্রহণ করো। হে আল্লাহ্! সা'দ-এর নিশানাকে লক্ষ্যভেদ করে দাও। হে সা'দ! আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত।"** ঘটনার ধারাবাহিকতায় হযরত সা'দ বলেন, আমি এভাবে করছিলাম; কিন্তু সে সময়ের আবহ এমন ছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল– আমাদের মাঝে কোনো ফেরেশ্তা এসে গেছে (আর) সেও (আমাদের) পাশাপাশি লড়াই করছে। কিন্তু সে সময় কেউ আমাকে বলে, তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)। এটি দিব্যদর্শনমূলক দৃশ্যও হতে পারে বা রণক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে থাকবে। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি তির নিক্ষেপ করতেই মহানবী (সা.) সাথে এই দোয়া করতেন, **"হে আল্লাহ্! তার তির লক্ষ্যভেদী করে দাও এবং তার দোয়া গ্রহণ করো।"** এমনকি যখন আমি তূণ থেকে তির নিক্ষেপ করে শেষ করি তখন মহানবী (সা.) নিজের তূণ থেকে তির বের করে ছড়িয়ে দেন এবং আমাকে ফলা ও পালকহীন একটি তির প্রদান করেন আর সেটি অন্যান্য তিরের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ বা বেশি গতিশিল ছিল। আল্লামা যুহরী লিখেছেন, সেদিন সা'দ (রা.) এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন অল্প কয়েকজন সাহাবী অবিচল রয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-র ভূমিকা সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন:

মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা.)-র হাতে তির তুলে দেন আর হযরত সা'দ (রা.) উপর্যুপরি শত্রুদের লক্ষ্য করে সেসব তির ছুঁড়তে থাকেন। একবার মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, **"তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা নিবেদিত,**

অনবরত তির নিক্ষেপ করতে থাকো"। সা'দ (রা.) সারা জীবন শব্দগুলো অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন।'

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) নিজের তূণ থেকে তির বের করে আমার সামনে ছড়িয়ে দেন এবং তিনি (সা.) বলেন, **"তির নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত"**। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি মহানবী (সা.)-কে কখনো হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ব্যতিরেকে অন্য কারও জন্য নিজের পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার দোয়া করতে শুনি নি'। উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেছিলেন, **"আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত, তির চালিয়ে যাও। হে শক্তিশালী যুবক! তির ছুঁড়তে থাকো"**। কিন্তু বুখারীতে অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, ইতিহাসে হযরত সা'দ (রা.) ব্যতিরেকে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র নামও পাওয়া যায়, যাকে মহানবী (সা.) বলেছেন, فداك أبي وأمي **(ফিদাকা আবি ওয়া উম্মী)** অর্থাৎ, **"আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য নিবেদিত"**।

অনুরূপভাবে হযরত আবু দুজানা (রা.)-র কুরবানীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু দুজানা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় তাঁর জন্য ঢাল হিসেবে ছিলেন। অর্থাৎ, তিনি মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে তাঁর দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হন। যে তিরই আসতো তা হযরত আবু দুজানা (রা.)-র কোমরে বিদ্ধ হতো। তিনি (সম্মুখে) ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর সকল তির নিজ পিঠে ধারণ করছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর পিঠে অগণিত তির বিদ্ধ হয়ে যায়।

হযরত আবু দুজানার অবিচলতার বিষয়ে মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, হযরত আবু দুজানা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নিজের শরীর দ্বারা তাঁর (সা.) শরীর আগলে রাখেন। যে তির আর পাথরই আসতো তা তিনি নিজের ওপর নিতেন। একসময় তাঁর শরীর তির বিদ্ধ হতে হতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। কিন্তু তিনি উফ্ শব্দটুকুও করেন নি। পাছে তার শরীর নড়লে মহানবী (সা.)-এর শরীরের কোনো অংশ অরক্ষিত হয়ে যায় এবং তাঁর (সা.) দেহে কোনো তির বিদ্ধ হয়।

এরপর রয়েছেন হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.)। তিনিও মহা মর্যাদাবান সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি উহুদের দিন অবিচলতা দেখিয়েছেন। এদিন তিনি মৃত্যুর শর্তে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তিনি সেদিন মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। শত্রুর ভয়াবহ আক্রমণের ফলে যখন মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে সেদিন তিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে তির নিক্ষেপ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সাহলের হাতে তির তুলে দাও কেননা সে দক্ষ তিরন্দাজ।

এরপর একজন মহিলা সাহাবীরও উল্লেখ পাওয়া যায় যার নাম ছিল হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)। তিনি উহুদের যুদ্ধে বীরত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। আর এই বীরত্বের নৈপুণ্য প্রদর্শনকারী ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আত্মত্যাগী সাহাবীয়া। তার পুরো নাম ছিল উম্মে আম্মারা মাযানিয়াহ। হযরত উম্মে আম্মারার নাম ছিল 'নুসায়বা' অর্থাৎ তার প্রকৃত নাম ছিল 'নুসায়বা'। তিনি ছিলেন হযরত যায়েদ বিন আসেমের সহধর্মিণী। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে আম্মারা স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের সময় আমি এটি দেখার জন্য রওয়ানা হই যে, লোকজন কী করছে! আমার কাছে পানি ভর্তি একটি মশকও ছিল যা আমি

আহতদের পান করানোর জন্য নিজের সাথে নিয়ে নিয়েছিলাম। একপর্যায়ে আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। সে-সময় তিনি সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন মুসলমানরা ভালো অবস্থানে ছিল; [অর্থাৎ যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থার কথা হচ্ছে।] আকস্মিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; [অর্থাৎ গিরিপথ ছেড়ে দেয়া এবং পশ্চাৎ দিক থেকে মুশরিকদের হামলা করার যে ঘটনা ঘটেছিল– সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।] তিনি বলেন, এদিকে মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর ওপর একযোগে হামলা করে। এই অবস্থা দেখে আমি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকি। আমি তরবারি দ্বারা শত্রুকে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমি তিরও নিক্ষেপ করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি নিজেও আহত হয়ে যাই। তার কাঁধে গভীর এক আঘাত লাগে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাকে কে আহত করেছে? তিনি বলেন, ইবনে কামিয়া। হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন মহানবী (সা.)-এর পাশ থেকে হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তখন সে তথা ইবনে কামিয়া একথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে থাকে যে, মুহাম্মদকে আমায় চিনিয়ে দাও, কেননা আজ সে রক্ষা পেলে বুঝবে– আমার রক্ষা নেই। অর্থাৎ আজ হয় সে মরবে নয়তো আমি মরব। তিনি বলেন, সে যখন কাছে আসে তখন আমি এবং মুসআব বিন উমায়ের তার পথে বাদ সাধি। তখন সে আমার ওপর হামলা করে আমার কাঁধে আঘাত হানে। (তোমরা আমার কাছে কাঁধের আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ; সে এই আঘাত করেছে)। আমি তার ওপর কয়েকবার আঘাত করি, কিন্তু খোদার এই শত্রু দুটি বর্ম পরিহিত ছিল।

কতক আলেম লিখেছেন, উহুদের যুদ্ধে নুসায়বা, তার স্বামী হযরত যায়েদ বিন আসেম এবং তাদের উভয় পুত্র খুবায়েব ও আব্দুল্লাহ্– সকলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের পরিবারকে আশিসমণ্ডিত করুন।

যাহোক মহানবী (সা.) এই দোয়া করলে উম্মে আম্মারা অর্থাৎ 'নুসায়বা' মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন যেন জান্নাতে আমরা আপনার সাথে থাকতে পারি। তিনি (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানাও। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা বলেন, এ জগতে এখন আমার কী হয় তা নিয়ে আর কোনো মাথাব্যথা নেই। এই যে দোয়া আমি লাভ করেছি, এটিই আমার জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি ডানে-বামে যেদিকেই তাকাতাম তাকে দেখতাম যে, সে আমার সুরক্ষার জন্য শত্রুদের সাথে লড়াই করছে। উহুদের যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বারোটি আঘাত পান, যার মধ্যে বর্শার আঘাতও ছিল এবং তরবারির আঘাতও ছিল।

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন: 'এক মুসলিম নারী যার নাম ছিল উম্মে আম্মারা, তিনি তরবারি হাতে সারি বিদীর্ণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছেন। সে সময় আব্দুল্লাহ্ বিন কামিয়া মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। এই মুসলিম নারী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে সেই আঘাত নিজের কাঁধে নেন এবং নিজের তরবারি উঠিয়ে তার ওপর আক্রমণ করেন, কিন্তু সে দ্বিগুণ বর্ম পরিহিত পুরুষ ছিল এবং তিনি দুর্বল নারী ছিলেন, এজন্য সেই আক্রমণ কার্যকরী হয় নি; ফলে ইবনে কামিয়া হুংকার তুলে সাহাবীদের সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয়

এবং সাহাবীদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নিকটে পৌঁছে যায় এবং পৌঁছামাত্রই এত প্রবলভাবে এবং নির্মমভাবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় আঘাত করে যে, সাহাবীদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী হযরত তালহা (রা.) ঝাঁপিয়ে পড়ে খোলা হাতে সেই আঘাত প্রতিহত করেন, কিন্তু ইবনে কামিয়ার তরবারি তার হাত ছিন্ন করে মহানবী (সা.)-এর এক পাশে লাগে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আঘাত গুরুতর ছিল না, কেননা মহানবী (সা.) উপর-নীচে দুটি বর্ম পরিধান করে রেখেছিলেন এবং হামলার তীব্রতাও হযরত তালহা (রা.)-র আত্মত্যাগমূলক পদক্ষেপের কারণে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এই আঘাতে মহানবী (সা.) মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যান আর ইবনে কামিয়া পুনরায় আনন্দে এ স্লোগান দেয় যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। ইবনে কামিয়া তো মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে আনন্দে স্লোগান দিয়ে পিছু হটে যায় আর আত্মপ্রাসাদ নিতে থাকে যে, আমি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করেছি। কিন্তু মহানবী (সা.) পড়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) জীবিত আছেন এবং নিরাপদে আছেন– একথা জানতে পেরে অধিকাংশ সাহাবীর বিমর্ষ চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমশ যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস পেতে শুরু করে; কেননা মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন– এই (গুজবের) প্রশান্তিতে কাফিররা কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। আর তাদের কতক নিহতদের দেখাশোনা ও কতক মুসলমান শহীদদের লাশ বিকৃত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে যুদ্ধের প্রতি অমনযোগী হয়ে পড়ে। আর অপরদিকে অধিকাংশ মুসলমানও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সাথে কথোপকথনের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং কীভাবে কুরাইশরা ফেরত আসে (এ বিষয়টিও)। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন কাফিররাও তাঁর পিছু নেয়। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সুফিয়ান তিনবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি মুহাম্মদ (সা.) আছে? মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে জবাব দিতে নিষেধ করেন। এরপর সে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি আবু কোহাফার ছেলে অর্থাৎ আবু বকর আছে? এরপর তিনবার জিজ্ঞেস করে যে, তাদের মাঝে কি ইবনে খাত্তাব অর্থাৎ উমর আছে? এরপর সে তার সাথিদের নিকট ফেরত যায় আর বলতে থাকে, এরা সবাই নিহত। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না আর বলে বসলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! খোদার কসম, তুমি মিথ্যা বলেছ। যাদের তুমি নাম নিয়েছ তারা সবাই জীবিত। যা কিছু তোমার কাছে অসহনীয়– এর মাঝে বহু কিছু তোমার এখনো দেখা বাকি আছে। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। আবু সুফিয়ান বলল, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ। যুদ্ধ বালতির বা দোলকের মতো হয়ে থাকে। কখনো একপক্ষের বিজয় হয় আর কখনো অপরপক্ষের বিজয়। তোমাদের লোকদের মাঝে এমন কিছু লাশ পাবে যাদের নাক-কান কেটে ফেলা হয়েছে, অর্থাৎ 'মুসলা' করা হয়েছে। সে বলল, আমি এর আদেশ দেই নি, কিন্তু আমি একে মন্দও মনে করি না। এরপর সে রণসঙ্গীত হিসেবে এই বাক্য পড়তে লাগল, 'উলু হুবল' 'উলু হুবল'- হুবল দেবতার জয় হোক, হুবল দেবতার জয় হোক। মহানবী (সা.) বললেন, এখনো কি তোমরা উত্তর দিবে না? সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্ল!' আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে মর্যাদাবান। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের উযযা নামের দেবতা আছে, তোমাদের উযযার মতো কোনো দেবতা নেই। মহানবী (সা.) এটি শুনে বললেন, তোমরা

কি এখনো তার উত্তর দিবে না? হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু মওলানা ওয়ালা মওলা লাকুম'। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। এরপর আবু সুফিয়ান চিৎকার করে মুসলমানদের বলল, আগামী বছর বদরের ময়দানে তোমাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। এতে মহানবী (সা.) নিজের এক সাহাবীকে বললেন, বলে দাও ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্ নবীঈন' পুস্তকে লিখেন, এদিকে মুসলমানরা নিজেদের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিল আর অপরদিকে অর্থাৎ নীচে যুদ্ধের মাঠে মক্কার কুরাইশরা মুসলমান শহীদদের লাশগুলোর নির্মমভাবে অমর্যাদা করছিল। 'মুসলা'র হিংস্র প্রথা চরম হিংস্রতার সাথে পালন করা হচ্ছিল এবং মুসলমান শহীদদের লাশগুলোর সাথে মক্কার রক্তপিপাসু পশুরা তাদের যা খুশি তা করেছে। কুরাইশদের নারীরা মুসলমানদের নাক, কান কেটে গলার মালা বানিয়েছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযা (রা.)-র কলিজা বের করে চিবিয়েছে। মোটকথা স্যার উইলিয়াম মুইর-এর ভাষ্যমতে, মুসলমানদের লাশের সাথে কুরাইশরা ভয়ানক হিংস্র আচরণ করেছে। মক্কার নেতারা দীর্ঘক্ষণ রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর লাশ খুঁজতে থাকে আর এই দৃশ্য অবলোকন করার তাদের আগ্রহ অপূর্ণই রয়ে যায়। যা পাওয়ার ছিল না তা পেল না। এটা তো হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা তিনি সেখানে ছিলেন না। এই খোঁজে হতাশ হয়ে আবু সুফিয়ান নিজের গুটিকয়েক সাথিকে নিয়ে সেই গিরিপথের দিকে অগ্রসর হয় যেদিকে মুসলমানরা একত্রিত হয়েছিল। আর এর নিকটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, মুসলমানরা! তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মদ আছে (সা.)? মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন উত্তর না দেয়। সে অনুযায়ী সব সাহাবী নীরব রইলেন। এরপর সে আবু বকর ও উমরের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী কেউ উত্তর দিল না। এতে সে গর্বের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বলল, এরা সবাই নিহত হয়েছে, কেননা তারা যদি জীবিত থাকত তাহলে উত্তর দিত। তখন হযরত উমর (রা.) আর নীরব থাকতে পারলেন না আর অবলীলায় বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী। আমরা সবাই জীবিত আছি আর খোদা আমাদের হাতে তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন। আবু সুফিয়ান হযরত উমরের (রা.) গলার স্বর চিনতে পেরে বললেন, উমর! সত্য করে বলো, মুহাম্মদ কি জীবিত আছে? হযরত উমর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে! খোদার অনুগ্রহে তিনি জীবিত আছেন এবং তোমার কথাগুলো শুনছেন। আবু সুফিয়ান কিছুটা ক্ষীণস্বরে বলল, তাহলে ইবনে কামিয়া মিথ্যা বলেছে, কেননা আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশি সত্যবাদী মনে করি। এরপর আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলল, 'উলু হুবল' অর্থাৎ হুবল দেবতার জয় হোক। রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশের কথা ভেবে সাহাবীগণ নিশ্চুপ ছিলেন, যেহেতু তিনি (সা.) প্রথমে তাদেরকে উত্তর দিতে বাধা দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের নাম উচ্চারণ হওয়া পর্যন্ত সাহাবীদের চুপ থাকতে বলেন, কিন্তু যখন খোদা তা'লার বিপরীতে প্রতীমার জয়ধ্বনি দেওয়া শুরু হয় তখন তিনি (সা.) আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না আর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কেন উত্তর দিচ্ছ না? সাহাবা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কী উত্তর দিব? তিনি (সা.) বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্ল' অর্থাৎ মহত্ব ও সম্মান একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই জন্য। (এ কথা শুনে) আবু সুফিয়ান বলল, 'লানা উযযা ওয়ালা উযযা লাকুম'। আমাদের তো একজন উয্যা (দেবতা) আছে আর তোমাদের

তো কোনো উয্যা নেই। মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বলো, 'আল্লাহু মওলানা ওয়ালা মওলা লাকুম'- 'উয্যা আর কী জিনিস! আমাদের সাথে তো আমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ্ তা'লা আছেন, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নাই।'

এরপর আবু সুফিয়ান বলল, 'যুদ্ধ তো কুয়ার বালতির ন্যায় যা কখনো ওপরে উঠে আসে আবার কখনো নীচে নেমে যায়। সুতরাং তোমরা এই দিনটিকে বদরের প্রতিশোধ মনে করতে পার। আর তোমরা যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের লাশগুলোকে বিকৃত ও অঙ্গচ্ছেদকৃত অবস্থায় দেখতে পাবে। আমি এমনটি করার নির্দেশ দেই নি, কিন্তু আমি যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারলাম তখন আমার কাছে আমার সৈন্যদের এমন কাণ্ড খারাপও লাগে নি। তোমাদের সাথে আগামী বছর এই দিনগুলোতে বদরের প্রান্তরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি রইল। রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশে একজন সাহাবী (আবু সুফিয়ানের কথার) উত্তরে বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে এমনটিই কথা থাকল'। একথা বলে আবু সুফিয়ান নিজ সঙ্গীদের নিয়ে (পাহাড় থেকে) নীচে নেমে গেল এবং কুরাইশ সেনাবাহিনী দ্রুত মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।

তিনি লিখেন, একটি অদ্ভুত বিষয় হলো কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে বাহ্যত বিজয় লাভ করেছিল এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা যদি চাইতো তাহলে তারা তাদের এই বিজয় থেকে লাভবান হতে পারতো। মদীনার উপর আক্রমনের পথ তো তাদের জন্য খোলাই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ঐশী হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে কুরাইশরা বাহ্যত বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল, আর উহুদের প্রান্তরে তাদের এই বিজয়কেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট জ্ঞান করে দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াকে সমীচীন মনে করলো। অপরদিকে রসূল করীম (সা.)-ও অতিরিক্ত সাবধানতামূলকভাবে দ্রুত সত্তরজন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি দল প্রস্তুত করে কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর পিছনে প্রেরণ করেন; যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)ও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এটি বুখারীর বর্ণনা। সাধারণ ঐতিহাসিকগন বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে আবার অন্য কিছু বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রা.) কুরাইশদের পিছু ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা এসংবাদ আনার চেষ্টা কর যে কুরাইশ বাহিনী আবার মদীনার উপর আক্রমণ করার দুরভিসন্ধি রাখে কিনা? তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা যদি দেখ কুরাইশরা তাদের উটে আরোহিত অবস্থায় আছে এবং ঘোড়াগুলোকে আরোহীশূণ্য হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা ধরে নিবে যে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে এবং মদীনার উপর আক্রমন করার অভিপ্রায় তাদের নেই। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় থাকে তাহলে বুঝে নিবে যে তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তিনি (সা.) তাদেরকে তাগিদ সহকারে বললেন, কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী যদি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয় তাহলে দ্রুত যেন তাঁকে (সা.) সংবাদ দেয়া হয়। তিনি (সা.) উত্তেজিত অবস্থায় বললেন, 'এবার যদি কুরাইশরা মদীনার উপর আক্রমণ করে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদেরকে প্রতিহত করে তাদেরকে এই হামলার মজা টের পাইয়ে দেবো'। মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত দল তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পিছনে রওয়ানা হলো এবং অতিদ্রুত এই সংবাদ নিয়ে ফিরে আসল যে, কুরাইশ বাহিনী মক্কার দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর আহত হয়ে অজ্ঞান হওয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'কিছুক্ষণ পরেই রসূল করীম (সা.)-এর জ্ঞান ফিরে আসল আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে এই ঘোষণা করার জন্য লোক

পাঠালেন, মুসলমানরা যেন পুনরায় একত্রিত হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল পুনরায় একত্রিত হতে শুরু করল আর মহানবী (সা.) তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত হলেন। পাহাড়ের কোলে অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলল, আমরা মুহাম্মদকে (সা.) হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের একথার উত্তর দেন নি, পাছে শত্রুরা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরে আক্রমণ করে বসে এবং ক্ষতবিক্ষত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়ে যায়। ইসলামী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যখন একথার কোনো উত্তর পেল না তখন আবু সুফিয়ান নিশ্চিত হয়ে গেল, এ ধারণা সঠিক এবং সে গগনবিদারী কণ্ঠে বলে ওঠে, আমরা আবু বকরকেও মেরে ফেলেছি। মহানবী (সা.) আবু বকরকেও নির্দেশ দিলেন, কোনো উত্তর দিও না। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, আমরা উমরকেও মেরে ফেলেছি। তখন উমর যিনি কি–না উত্তেজিত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তিনি একথার উত্তরে বলতে চাইলেন যে, আমরা সবাই খোদার কৃপায় জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মহানবী (সা.) এ বলে নিষেধ করেন যে, মুসলমানদের কষ্টে ফেলো না আর চুপ থাকো।

এমতাবস্থায় কাফিরদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর ডান–বামের লোকদের অর্থাৎ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লোকদের হত্যা করেছি। এ কারণে আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আনন্দের আতিশয্যে ধ্বনি উচ্চকিত করে বলে, ইয়া উলু হুবল! উলু হুবল! অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হুবলের মর্যাদা উন্নীত হোক, কেননা সে আজ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই রসূল (সা.) যিনি তাঁর নিজের, আবু বকরের এবং উমরের মৃত্যুর ঘোষণার পর চুপ থাকার নির্দেশ প্রদান করেন যেন আহত মুসলমানদের ওপর পুনরায় শত্রুরা ফিরে এসে আক্রমণ না করে এবং মুষ্টিমেয় মুসলমান তাদের হাতে শহীদ না হয়ে যায়, এখন যখন এক–অদ্বিতীয় খোদার মর্যাদার প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এবং শিরকের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হয়েছে– তখন তাঁর (সা.) অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর তিনি (সা.) অত্যন্ত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কী বলব? তিনি (সা.) বলেন, বলো! আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল। অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হুবলের মর্যাদা উন্নীত হয়েছে। এটি তোমাদের মিথ্যা। বরং এক–অদ্বিতীয় আল্লাহ্-ই পরম সম্মানিত এবং তাঁর সম্মানই অতি মহান। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর জীবিত থাকার সংবাদও শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেন। এই বীরত্বপূর্ণ ও তেজোদীপ্ত উত্তরে কাফির সৈন্যদের ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তাদের আশাভরসা সব মাটিতে মিশে গেল এবং তাদের সামনে হাতেগোণা কতক আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল যাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে মেরে ফেলা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই সম্ভব ছিল, কিন্তু তারপরও তারা পুনরায় আক্রমণ করার সাহসই দেখাতে পারে নি। আর যতটুকু বিজয় তারা অর্জন করেছিল সেটির আনন্দে মেতে মক্কায় ফেরত চলে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন আঙ্গিকে এই ঘটনাটি নানান জায়গায় বর্ণনা করেছেন যা আগামীতেও বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি যেমনটি সবসময় দোয়ার জন্য বলে থাকি– আবার বলছি, ফিলিস্তিনীদের সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। শুনেছি, সম্ভবত গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চলছে আর ইসরাঈলী সরকারও হয়ত তা কিছুটা মেনে নেবে। কিন্তু লেবানন সীমান্তে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রভাব পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনীদের ওপর পড়তে

পারে। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ন্যায়ের লেশমাত্রও নেই। বর্তমানে তাদের লেখকরাই আরো প্রকাশ্যে লিখছে যে, অন্যায় চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আমেরিকার নেতারা কেবল তাদের অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য যুদ্ধ করাচ্ছে এবং এর ফলে তাদের আয়ও বাড়ছে, কেননা তাদের অস্ত্রের কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তো তাদের নিজেদের বিশ্লেষকরাও এটি বলছে, আমেরিকা নিজেদের অর্থনীতি চাঙ্গা করার মানসে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করছে এবং পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তারা জানে না, এরা খোদা তা'লার শাস্তি এড়াতে পারবে না। আহমদীদের নিজেদের দোয়া এবং যোগাযোগের মাধ্যমে ধ্বংস থেকে বাঁচার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সম্প্রতি একটি সংবাদ পাওয়া গেছে, জাতিসংঘের সাহায্যকারী সংস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশ তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এ অজুহাতে যে, তাদের এগারো-বারোজন মানুষ হামাসের সাথে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে– এ কারণে ফিলিস্তিনীদেরকে তারা সাহায্য করবে না। এ হলো নির্দয় আচরণ। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে আরও চাপের মধ্যে ফেলা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্ব যদি সাহায্য বন্ধ করে থাকে তাহলে তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলমান দেশগুলো কেন ঘোষণা করল না যে, আমরা সাহায্য করব। কেননা জাতিসংঘের সেই সংস্থাটি ঘোষণা দিয়েছে যে, সাহায্য যদি না আসে তাহলে ফেব্রুয়ারির পরে আমরা সেখানে কোনো ত্রাণ পাঠাতে পারব না। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম দেশগুলোকেও নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন আর পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য দূর করুন। এখন ইরানের সাথেও যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও দোয়া করবেন। আমাদের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী সেখানে কারাগারে বা নজরবন্দি থাকা অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা না পাবার কারণে মৃত্যু বরণ করেছেন। বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া দুষ্কর। যাহোক, যারা কষ্টে দিনাতিপাত করছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। বিস্তারিত তথ্য পাবার পর মরহুমের জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সবসময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আহমদীদেরকে টার্গেট করা হয় আর একইভাবে কতক উগ্রপন্থি সংগঠনের পক্ষ থেকেও জামা'ত শঙ্কার সম্মুখীন। জামা'ত ও জামা'তের সদস্যরা সব স্থানেই দ্বিমুখি হুমকির সম্মুখীন। প্রথমত নাগরিক হিসেবে আর (দ্বিতীয়ত) একজন আহমদী হবার কারণেও। রাবওয়া এবং অন্যান্য শহরের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে নিজ সুরক্ষায় রাখেন, তাদের দুষ্কর্মের ফল যেন তাদের ওপরই বর্তায় আর প্রত্যেক দেশের আহমদীদের যেন আল্লাহ্ সুরক্ষা করেন। পৃথিবীবাসী যেন এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লাকে চেনা আর আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করার মাঝেই তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)